যখন আইনি প্রক্রিয়ার অনানুষ্ঠানিক প্রতিরূপ তৈরি হয়ঃ ভারতে বিবাহবিচ্ছেদের আখ্যান

যুগাঙ্ক গোয়েল

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

যখন আনুষ্ঠানিক আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, এবং চলিত প্রথাগুলি ওই বিবাদ মেটানোর জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত নয়, তখন কোনও বিবাদের সমাধান কিভাবে সম্ভব? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করি যে, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মানুষ বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করে অনানুষ্ঠানিকভাবে, কিন্তু তা করার সময় তাঁরা সরকারী প্রক্রিয়াকে নকল করে, একটা ধরনের আনুষ্ঠানিক আদালত-সুলভ কাঠামো অনুসরণ করেন। এই কাঠামো বাহ্যিকভাবে সমস্যার সমাধানের আনুষ্ঠানিক বা আইনসম্মত প্রক্রিয়ার অনুরূপ হয়, এবং এমন ভান করা হয় যেন এই গোটা বিধিবহির্ভুত প্রক্রিয়াটি আইনসম্মত।

এক সময় সাম্রাজ্যবাদের শিকার ছিল, বিশ্বের এমন অনেক গোষ্ঠীতেই সমস্যার সমাধানের জন্য অনানুষ্ঠানিক সামাজিক প্রথা অনুসরণ করার ধারণাকে আইনি বহুত্ববাদ (একটি সমাজব্যবস্থা বা ভৌগলিক পরিসরের মধ্যে একাধিক আইনের অস্তিত্ব) বিষয়ে যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। এই গবেষণাগুলি যা ভুলে যায় তা হল, যে গোষ্ঠীগুলিতে আগে থেকেই কোনও অনানুষ্ঠানিক সামাজিক প্রথার প্রচলন নেই, সেগুলির ক্ষেত্রে আইন কিভাবে একটি এমন কাঠামো পেষ করে, যাকে ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা অনানুষ্ঠানিকভাবে সমস্যার সমাধানের নিজস্ব সংস্করণ হিসেবে উপযোগী করে তুলতে পারেন। আইনের বিষয়ে সচেতনতা নিয়ে লেখালেখিতে যেমন দেখান হয়, এই বিষয়টিকে ধরতে পারাই মানুষ কিভাবে "আইনকে কল্পনা করে", তা বোঝার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে। বিবাহবিচ্ছেদের আইনগত প্রতিষ্ঠানটি এই বিষয়ের একটি সার্থক উদাহরণ।

সাহচর্য থেকে পলায়ন বনাম সাহচর্যকেন্দ্রিক আইন থেকে পলায়ন

ভারতে বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যাক। দাম্পত্য বিষয়ক আইন এমন ভাবে তৈরি হয় যাতে তা বিবাহ সম্পর্ককে ভাঙার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। এই কারণে, এমনকি দম্পতি যখন পরস্পরের সম্মতিতে আলাদা হচ্ছেন, তখনও ভারতে বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার খরচ অসম্ভব বেশি এবং তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয় মানসিক ও অর্থনৈতিক বোঝা। একই সঙ্গে, আদালতের বাইরে কোনও রকম বোঝাপড়ায় আসাও সম্ভব না, কারণ আদালত থেকে বিবাহবিচ্ছেদের রায় ছাড়াই আলাদা থাকা আইনের চোখে বৈধ নয়। ঐতিহাসিকভাবে, ভারতের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী, এবং তাঁদের জন্য বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ক কোনও ধর্মভিত্তিক আইন আগে ছিল না। যদি একান্তই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটত, তাহলে তা গোষ্ঠীগুলি নিজেদের পুরুষানুক্রমিক রীতি অনুযায়ী তার সমাধান করত। মাত্র ১৯৫৫ সালে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট (এইচএমএ)-এর অধীনে বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়াকে বিধিবদ্ধ করা হয়।

আগে যেমন হত, ছোট পল্লীগ্রামে যদি কোন দম্পতি বিবাহবিচ্ছেদ চাইতেন, তাহলে তাঁরা আলাদা থাকতে শুরু করতেন, এবং তাঁদের এই সিদ্ধান্তের কথা গ্রামের বাকিদের জানিয়ে দিতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে ঘিরে জীবনযাপন করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক আদালতের জারি করা "সার্বজনীন" রায়ের কোন প্রয়োজন হত না। কিন্তু, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট আইনটি চালু হওয়ার পর থেকে, বিবাহিচ্ছেদের জন্য এই ধরনের

দম্পতিকে বহুদূরের কোন শহরে গিয়ে বিবাহবিচ্ছেদের দুর্বহ ও অনেক সময়ই দুর্বোধ্য প্রক্রিয়াটি শুরু করতে হচ্ছে, যা মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে। স্পষ্টতই, এই রকম অসুবিধাজনক প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়ে উৎসাহিত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

আইনের প্রতিরূপ

এখনকার আইনের আদেশ অনুযায়ী, বিবাহবিচ্ছেদ বৈধ হবে একমাত্র তখনই, যখন তা আদালতের থেকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবে। তাহলে, যে দম্পতিরা বিবাহবিচ্ছেদ বা আনুষ্ঠানিকভাবে পরস্পর থেকে পৃথক থাকতে চাইলেও, আদালতের সুদীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়াকে এড়াতে চাইবেন, তাঁদের করণীয় কি? এক্ষেত্রে, বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার সময় একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য তৈরির জন্য, আইন কি ধরনের পদক্ষেপ নিত তা কল্পনা করে নিয়ে, বাহ্যিকভাবে তার অনুকরণ করতে পারেন তাঁরা। একে আমরা বলি "আইনের প্রতিরূপ" বা "লিগ্যাল অ্যাপারিশান"। এ হল এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ আনুষ্ঠানিক আইনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে, ওই আইনগুলিরই অনুকরণ করে থাকেন। এই অনুকরণ এই প্রক্রিয়াকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়। অনেক সময়ই আইনজীবীরা মক্কেলকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই রকম কাজ করে থাকেন, কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলি যে অনেক সময়ই "আসল আইন" নয়, বরং আইনের প্রতিরূপ, তা আইনজীবী ও মক্কেলের মধ্যে কেউই স্পষ্টভাবে নাও জানতে পারেন।

চারটি ভারতীয় রাজ্যের আইনজীবীদের মধ্যে একটি প্রাথমিক নিরীক্ষা এবং তিনটি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা পর্যবেক্ষণের পর আমি আবিষ্কার করি যে, বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আইনের প্রতিরূপের ব্যাপক ব্যবহার হয়। এই সময় দম্পতি ও আইনজীবী হলফনামা, নোটারাইজড বৈধ স্ট্যাম্প পেপারের মত আইনি সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করে আইনি পদক্ষেপ অনুসরণ করার নিখুঁত অভিনয় করেন। আইনজীবীদের কামরাতে এই জাতীয় আইনি প্রতিরূপের উপস্থিতি দেখা গেলেও এগুলিকে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কানুন, লরাটো, আইপ্লিডার্স, অ্যাডভোকেটখোঁজ, বা বিধিকার্যের মত ওয়েবসাইটে, যেখানে হাজার হাজার আইনজীবী নানা প্রশ্নের উত্তরে বিশদে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আদালতের বাইরে বিবাহবিচ্ছেদের উপায় সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে, এই আইনজীবীদের মধ্যে কয়েকজন আইনি প্রক্রিয়ার "পাশ কাটিয়ে যাওয়ার" পন্থা নির্দেশ করেছেন। এই পন্থাগুলির মধ্যে একটি যেমন, "বিচ্ছেদের চুক্তি"-তে রাজি হওয়া। এঁদের মতে এই ধরনের চুক্তি আইনের চোখে বৈধ। তাঁরা এমনকি তার বিষয়বস্তু ও স্ট্যান্ডার্ড-ফর্মের টেমপ্লেটও বাতলে দেন। এই ওয়েবসাইটগুলিতে দৈনিক হাজার হাজার মানুষ প্রশ্ন রাখেন ও উত্তর খোঁজেন।

গ্রামীণ ভারতে পঞ্চায়েতি বিবাহবিচ্ছেদের সময়েও আইনের প্রতিরূপের ব্যবহার দেখা যায়। এই ধরনের বিবাহবিচ্ছেদের সময় গ্রামের মাথারা নিয়মিতভাবে সাক্ষী এবং গ্রামবাসীদের সামনে আদালত-সুলভ আচরণের মধ্যে দিয়ে বিচ্ছেদের বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক রায় দিয়ে থাকেন। এই রকম ব্যবস্থাপনার ফলে তাঁদের এই আচরণে একটা ধরনের আনুষ্ঠানিকতা আসে। বিশেষ করে, যে রায়গুলি পরে আনুষ্ঠানিক আদালত অবধি গড়াবে, সেগুলির ক্ষেত্রে আইনি প্রতিরূপের উপস্থিতি অনেক বেশি স্পষ্টভাবে থাকে। এই রকম একটি মামলায়, যেখানে এই রকম চলিত প্রথায় হওয়া বিবাহবিচ্ছেদকে আনুষ্ঠানিক আদালত বাতিল করে দিয়েছিল, সেখানে ঠিক কি ঘটেছিল তা আদালতের রায় থেকে আমরা জানতে পারি। এই অনানুষ্ঠানিক বিবাহবিচ্ছেদের রায়টি দেওয়া হয় "মধ্যস্থতাকারীদের সামনে" এবং "মধ্যস্থতাকারীদের নির্দেশে, মৃত গোবিন্দরাজ, বিবাদীকে ৭,০০০ টাকা দেওয়ার পর পন্ডলগুডির সাব-রেজিস্টারের অফিসে ২৪.৭.১৯৭৮ তারিখে বিবাহবিচ্ছেদের চুক্তিপ্ত্র লেখা হয় এবং এই চুক্তিপত্রে গোবিন্দরাজ ও বিবাদী সই করেন।" এই অনানুষ্ঠানিক রায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা ও বৈধতার প্রতিনিধি, অর্থাৎ সাব-রেজিস্টারের উপস্থিতিটি লক্ষনীয়। নথিভুক্তিকরণ ও লেখালিখির মত আইনি সাজসরঞ্জাম এমন একটি আবহাওয়া তৈরি করে, যা থেকে মনে হয় যে আনুষ্ঠানিক কিছু একটা ঘটছে।

মনে রাখা দরকার যে, এইচএমএ বিবাহবিচ্ছেদের চলিত প্রথাগুলিকে অনুমোদন দেয়, কিন্তু সেই অনুমোদন পেতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে, বিবাহসম্পর্কের অনানুষ্ঠানিক বিচ্ছেদের যে প্রক্রিয়াটির অনুসরণ করা হয়েছে, তা সত্যিই ওই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রীতি। এই আইনে "চলিত প্রথা" শব্দগুচ্ছের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে, ওই প্রক্রিয়াটি যে আদৌ এই তকমা পাওয়ার যোগ্য, তা প্রমাণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, ২০১৯ সালের একটি মামলার *ফরগতিনামার* মত নথি বা ২০০৭ সালের একটি মামলার ক্ষেত্রে *ছুট্টা ছুট্টি*-র মত প্রক্রিয়াকে "চলিত প্রথা" বলে ঘোষণা করা হলেও, আদালত তা স্বীকার করে নি। ২০১৬ সালের আরেকটি মামলায় রায় দেওয়ার সময় বিচারপতি আবিষ্কার করেন যে, বিবাহবিচ্ছেদের "চলিত প্রথা" হিসেবে দাবি করা হয়েছে এমন একটি নির্দিষ্ট পঞ্চায়েতি বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়া, যাকে বিবাহবিচ্ছেদের চলিত আইন হিসেবে চালানর চেষ্টা হচ্ছিল, তার কোন ঐতিহাসিক অস্তিত্বই নেই। যদিও এই মামলাটির ক্ষেত্রে, পঞ্চায়েতের নয়জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন এই বিচারে অংশগ্রহণ করেন ও নথিতে সইও দেন - অর্থাৎ বিচারের প্রহসনের চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছিল এই মামলায়। আমাদের গবেষণামূলক নিরীক্ষায় দেখি যে, ১৯৮০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আদালত নিয়মিতভাবে পঞ্চায়েতি বিবাহবিচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে বাতিল করে গেলেও, সেই ১৯৮০ থেকে শুরু করে ২০১৯ সালের মত অতিসাম্প্রতিক সময়েও আইনি প্রতিরূপ ব্যবহারের আগ্রহ আরও মজবুত হয়েছে।

বৈধপথে বিচ্ছেদের উপর আইন যে ধরনের বাধানিষেধ আরোপ করে সেগুলির দিক থেকে দেখলে, বিবাহবিচ্ছেদের মামলাগুলি আইনের প্রতিরূপের বিষয়ে জানার জন্য খুবই উপযোগী। ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে "বিচ্ছিন্ন" নারীপুরুষের সংখ্যা "বিবাহবিচ্ছিন্ন" নারীপুরুষের সংখ্যার তিনগুণ বেশি। এর থেকে বোঝা যায় যে, আসলে আদালতে হাজিরা দেওয়ার বিষয়টি বিবাহবিচ্ছেদ চাইছেন এমন দম্পতির জন্য ঠিক কতটা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। এই রকম আইনের অনুকরণ যে শুধুমাত্র ভারতেই ঘটে তা নয়। আদতে, কঠোরভাবে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী অনেক দেশই আইনসম্মত বিবাহবিচ্ছেদকে অতি সম্প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে, যেমন চিলেতে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ২০০৪ সালে। এর আগে তাহলে, চিলের নাগরিকরা বিবাহবিচ্ছেদ চাইলে কি করতেন? দেখা গেছে তাঁরাও নানা আইনি কৌশলই ব্যবহার করতেন। এই কৌশলগুলির মধ্যে কয়েকটিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। সিভিল অ্যানালমেন্ট – বিবাহবিচ্ছেদ চাওয়া স্বামীস্ত্রী প্রমাণ করতেন যে আদৌ কোন বিবাহই ঘটে নি, বা স্বামীরা অন্তর্ধানের ভান করতেন, স্ত্রীরা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে স্বামী তাঁদের ত্যাগ করেছেন বা স্বামীকে মৃত বলে ঘোষণা করতেন। এইভাবে আইনের প্রতিরূপকে তাঁরা নিজের কাজে লাগাতেন। একইভাবে, বাংলাদেশে যেখানে হিন্দুদের মধ্যে কোন বিবাহবিচ্ছেদের আইন নেই, সেখানে স্বামী-স্ত্রী অনেক সময়ই হলফনামার উপর শপথ করে বা কোন লিখিত চুক্তিপত্রে সই করে আলাদা থাকতে শুরু করেন।

আইনের প্রতিরূপের ব্যবহার কতটা সুদূরপ্রসারী?

শুধুমাত্র বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রেই যে আইনের প্রতিরূপের ব্যবহার হয়, এমন নয়। খণ্ডিত জমি ও সেগুলির মালিকানার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্বন্দোবস্ত বা ল্যান্ড কনসলিডেশানের (যাকে উত্তর ভারতে চাকবন্দী বলা হয়) সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনি প্রতিরূপের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন ধরা যাক, দুজন কৃষকের মালিকানায় দুটি জমির খণ্ড আছে, যা গ্রামে তাঁদের বাকি যে জমি আছে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন। একজন কৃষকের মালিকানাধীন বিচ্ছিন্ন জমিখণ্ডের লাগোয়া জমি অন্যজনের অধিকারে আছে। তাঁরা নিজেদের জমির আয়তন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে, পস্পরের সঙ্গে ওই জমির খণ্ডের মালিকানার হস্তান্তর করতে পারেন। এইরকম অবস্থার জন্য প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী এই চাকবন্দীর নির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও সেই প্রক্রিয়া ক্লান্তিকর ও দীর্ঘসূত্রী। এই কারণে, শঙ্কিত কৃষকরা তখন পঞ্চায়েতের দারস্থ হন। সেখানে তাঁদের বৈধ নথির মতই দেখতে একটি নথি দেওয়া হয়, যাতে আবেদনকারীর নামে জমির মালিকানার হস্তান্তরিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমির উপর তাঁদের অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও আদতে এই প্রক্রিয়ার কোনও আইনি বৈধতা নেই। ভাড়াটিয়া কৃষকরাও জমির মালিক কৃষকদের কাছ থেকে জমি ইজারা নেওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে একটা ধরনের (অবৈধ) চুক্তি করতে পারেন, যার ফলে ইজারা নেওয়ার প্রক্রিয়ায় আনুষ্ঠানিকতার একটা বাহ্যিক প্রলেপ পড়ে।

সমাজ ও আইনের বিষয়ে পণ্ডিতরা সমস্যার সমাধানের অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি বোঝার একটা কাঠামো তৈরি করতে পারলেও, আইনি প্রতিরূপের মত বিষয়টি এই ধরনের গভীর নিরীক্ষার বাইরেই থেকে গেছে। আইন পীড়ন করতে পারে, এমনকি দুর্বহও হতে পারে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত উর্বর। যখন তাঁরা অনানুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারেন না, তখন তাঁরা এমন ভাবে কার্য সম্পন্ন করেন, "যেন" তা আনুষ্ঠানিকভাবেই হয়েছে। আইন মেনে চলার অভিনয়ের বহিরাবরণটি, তার সারবত্তার মতই মজবুত হতে পারে। একটি সমাজব্যবস্থা আইনকে কিভাবে "ব্যবহার" করে তা ওই সমাজব্যবস্থার সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি হওয়া সম্ভব। আইনের প্রতিরূপ ব্যবহার করার বিষয়টি তাই এমন একটি অনন্যসাধারণ উপায়, যার মাধ্যমে আইনকে মানুষের কাজে লাগে। কাল্পনিক আইনের অনুকরণধর্মী প্রয়োগ তাই আইনের বিষয়ে সচেতনতার গুরুত্বকে দৃষ্টির গোচরে আনে এবং আইনি বহুত্ববাদের কাঠামোকে বিস্তৃত করে। যদি আইন একটি কাল্পনিক সমাজব্যবস্থাকে মাথায় রেখে তৈরি হয়, তাহলে একটি সমাজব্যবস্থাও কাল্পনিক আইনকে মাথায় রেখে বিবর্ধিত হতে পারে।

যুগাঙ্ক গোয়েল পুনের ফ্লেম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক পলিসি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর নলেজ অলটারনেটিভ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। সারা ভারতের জেলাস্তরের পরিসংখ্যান ও সংস্কৃতির ব্যাপক হারে নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে এই সংগঠনটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।